দৈনিক খবর ৫৬

তারিখ 15 DEC [illegible]
পৃষ্ঠা ... ৬ ক ... ৫ ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন—

॥ শহিদুল ইসলাম ॥

যদিও আজকের আলোচ্য বিষয় 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন', আমার আলোচনা মূলতঃ সীমাবদ্ধ থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে লিখতে বসলে প্রথমে যে প্রশ্নগুলো মনে আসে, তাহল বিশ্ববিদ্যালয় কি? কি তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য? সমাজের ও সরকারের সংগে তার সম্পর্ক কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন কি সমাজ ও রাষ্ট্র নিরপেক্ষ? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন কেন দরকার? কারা এর বিপক্ষে? কারাই বা পক্ষে? ইত্যাদি। আজও এসব প্রশ্নের উত্তরে নানা জনের নানা মতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে একটি বিষয়ে মোটামুটি একমত পৌঁছানো গেছে। তাহল, বিশ্ববিদ্যলয়ের স্বায়ত্তশাসন, সমাজ, রাষ্ট্র বা রাজনীতি নিরপেক্ষ নন। এটা আপেক্ষিক। সমাজ পরিবর্তনের সংগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র যেমন পাল্টে যায়, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের যেমন তারতম্য ঘটে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ধারণাও পাল্টে যেতে বাধ্য। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, চরিত্র এবং সর্বোপরি স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য— মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইউরোপের, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের সমাজে যে পরিবর্তন সূচীত হয়, তা জানা আবশ্যক। কেননা, সে দেশের অনুকরণে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং আজও পশ্চিমা সভ্যতার— সার সংগ্রহ করে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। তাই এই প্রবন্ধটিকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংজ্ঞা, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে স্বায়ত্তশাসন অপরিহার্য কেন এ বিষয়ে আলোচনা। দ্বিতীয় অংশে আছে, রাজনীতির সংগে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে এক নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক বরাবরই ছিল, সে সম্পর্কে আলোচনা। এ পর্যায়ে মূলতঃ ইংল্যাণ্ডের সমাজ পরিবর্তন ও সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চারিত্রিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় অংশে আছে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের একটি প্রতিবেদন।

ক· কর্নিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জেমসএ, পারকিন্স্ বিশ্ববিদযালয়ের তিনটি লক্ষ্য নির্দেশ করেছেন এবং তিনি মনে করেন এই তিনটি লক্ষ্য একত্রিত হলেই মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় সমাজে তার প্রকৃত ভূমিকা রাখতে পারে। সে তিনটি লক্ষ্য হলো ১· গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন, ২· শিক্ষাদানের প্রয়োগ প্রথম দুটি পুরনো ধারণা। তৃতীয়টি অর্থাৎ সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে জ্ঞানের প্রয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ভূমিকা থাকবে, এটি সাম্প্রতিক উপলব্ধি। জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের শুরু থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে থাকে। এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যায় না। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কখনও কোথাও সরাসরি দেশ পরিচালনা করেনি। শাসক শ্রেণীর শাসন ও শোষণ এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মানুষ সরবরাহ করে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় সমাজে কিভাবে এবং কতটুকু ভূমিকা রাখবে তা নির্ভর করে প্রধানতঃ শাসক শ্রেণীর চরিত্রের ওপর, দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল কাঠামোর ওপর।

তৃতীয় বিষয়ে অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন। তবে এটি আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, শিক্ষার সংগে অর্থনীতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। শিক্ষা আজ অন্যতম প্রধান উৎপাদনের হাতিয়াতে রূপান্তরিত হয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

অতি ক্ষুদ্র যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন সামাজিক ভূমিকা বলতে কিছু ছিল না। প্রায় হাজার বছরের সমাজ পরিবর্তনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক ভূমিকা ও মর্যাদা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আজ জাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সেই ধরনের প্রসাসনিক কাঠামো আশা করে যে ধরনের প্রশাসন ক্রীয়াশীল থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজতর হয়। 'সেই ধরনের প্রশাসনের নামই "স্বায়ত্তশাসন" যার অর্থ বাইরের হস্তক্ষেপ যুক্ত একটি সুষ্ঠু পরিবেশ যেখানে গবেষণা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে সমাজের ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। দালান-কোঠা, চ্যান্সেলর, উপাচার্য; সিনেট, সিন্ডিকেট ও শিক্ষা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারী মিলে যে একটি সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে যেখানে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত হয়, তাকেই বলে বিশ্ববিদ্যালয়। আর দালান-কাঠা, চ্যান্সেলর, উপাচার্যসহ সবই থাকলো, থাকলো না শুধু 'স্বায়ত্তশাসন' সে ধরনের প্রতিষ্ঠানের নাম আর যাই হোক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয় নয়।

ধারণা সেখান থেকেই উদ্ভূত। তবে এ ধারণা যখন থেকেই উদ্ভূত হোক না কেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের কোন না কোন অংশের কল্যাণ করে এসেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

গবেষণা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সমাজ যা আশা করে তাহ'লঃ ক· শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার সযত্নে রক্ষা করা; তার বিস্তৃতি ঘটানো এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তা হস্তান্তর করা। খ· শিক্ষার্থীর মননশীলতা বাড়িয়ে তোলা এবং তাকে একজন সচেতন ও সংবেদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। গ· স্বাধীন চিন্তার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা। ঘ· নিরাসক্তভাবে সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত হওয়া। ঙ· উপযুক্ত নেতৃত্ব গড়ে তোলা—— যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে মেধা ও যোগ্যতার সংগে কাজ করে দেশকে সম্মুখ পানে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

এসব বিষয়ে কারো মতবিরোধ নেই। তবে এসব যখন তৃতীয় লক্ষ্যের সংগে যুক্ত হতে পারে না, তখন বলা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় তার ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সমাজে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কতটুকু

খ· ১৯৬৫ সালের ৩১শে আগস্ট থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর টোকিওতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর ৬৫টি দেশের প্রায় ৩০০ প্রতিনিধিসহ ৫০০ জন সদস্য সেখানে একত্রিত হয়েছিলেন। সম্মেলনের তিনটি আলোচ্য বিষয়ের একটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন। ১৯৬২ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আইএইউ-এর প্রশাসনিক বোর্ডের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার দায়িত্ব স্যার হেক্টর হেথারিংটনের ওপর ন্যস্ত হয়। তাঁর তৈরী প্রতিবেদনটি নিয়ে প্রশাসনিক বোর্ড কেমব্রিজ ও মস্কোতে দীর্ঘ আলোচনায় বসেন এবং টোকিও সম্মেলনে পেশ করার জন্য চূড়ান্ত রূপ দেন।

উদ্বোধনী ভাষণে সমিতির সভাপতি ও ম্যাগগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল এমেরিটাস এফ সেরিল জেমস তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, "The problem of autonomy was as old as University institutions themselves. It had however, changed its nature gradually over the years, from the really autarchic independence of the University of Paris in the 12th and 13th Centuries, with its own Courts of justice, to an eventual recognition that there was a fluid relationship between the University and the community that it served— a relationship which was vital to the University itself, which required a degree of independence to do its work for the Community justly and properly and vital also to the Community." তবে সমাজের প্রতি

২-এর পাতায় দেখুন

সমস্যাজর্জরিত নড়াইলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

॥ শিক্ষাঙ্গন নিবন্ধ ॥

প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণের অভাব, বই-পুস্তক কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব সকল বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা এবং সর্বোপরি অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরির দরুন নড়াইল জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ দীর্ঘদিন থেকে হয়নি। ফলে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

নড়াইল জেলার ৩টি উপজেলার মোট ৭০টি মাধ্যমিক ও ২৪টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ৮টি মাধ্যমিক ও ৬টি নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। এছাড়া জেলায় ১৪টি মাদ্রাসা রয়েছে। সদর উপজেলায় ২৯টি বালক, ৬টি বালিকা বিদ্যালয়, লোহাগড়া উপজেলায় ২৪টি বালক, ৪টি বালিকা এবং কালিয়া উপজেলায় ১৭টি বালক ও ৪টি বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে।

জেলার ২টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বর্তমানে শোচনীয়। এর মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহ কাঁচা ও দীর্ঘদিন প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে বর্তমানে এগুলোর জরাজীর্ণ দশা বিরাজ করছে। অধিকাংশের বেড়া ও ছাউনি রয়েছে নামেমাত্র।

এদিকে জেলার ৩টি উপজেলায় যে সবল্পসংখ্যক পাকা বিদ্যালয় ভবন রয়েছে সেগুলোর অবস্থাও শোচনীয়। বৃটিশ আমলের নির্মিত এসব ভবনের প্লাস্টার খসে পড়ছে রড বেরিয়ে গেছে। ফলে এতে ক্লাস করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে গত কয়েক বছরের ঝড়ে জেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এসব বিদ্যালয় ভবনের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার আজ পর্যন্ত হয়নি। জেলার ২টি সরকারী বিদ্যালয় বাদে অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার টেবিল ও বেঞ্চ ও চক, ডাস্টার এবং ব্লাক বোর্ডের অভাব রয়েছে।

অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ায় মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই বিজ্ঞানাগার নেই। দু'একটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার থাকলেও প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। এদিকে বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের জন্য প্রতিবছর সরকার যে অর্থ মঞ্জুর করে থাকে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। অর্থাভাবে অনেক বিদ্যালয় শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পান না।

দু'একটা ছাড়া প্রায় সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নেই কমনরুম, নেই খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং ক্রীড়া শিক্ষক। দু'একটা বিদ্যালয় ছাড়া অনেক বিদ্যালয়েই ল্যাট্রিন ও খাবার পানির সংকট রয়েছে। ফলে সমস্যাজর্জরিত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এবং এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সমস্যার শেষ নেই। কিন্তু এসব সমস্যা ধীরে ধীরে সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগও নেই। ফলে ক্রমেই সমস্যার পাহাড় রচিত হচ্ছে। জরাজীর্ণ পুরাতন বিদ্যালয় ভবনগুলোর চেহারা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে।

এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন বিভিন্ন সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও বিশেষ ফললাভ ঘটেনি। এ ব্যাপারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে লেখালেখিও হয়েছে। এসব লেখায় সমস্যার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন বিশেষ কিছুই ঘটেনি।